নিউজলেটার

কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর
ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস ঢাকা-এর বুলেটিন

৪৩তম বর্ষ : ২য় সংখ্যা
জুলাই-অক্টোবর ২০২১ ইং
জিলহজ ১৪৪২-রবিউল আউয়াল ১৪৪৩ হিজরি

সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি
ড. সাইয়্যেদ হাসান সেহাত

সম্পাদনা পরিষদের সদস্য
নূর হোসেন মজিদী
আবদুল মুকীত চৌধুরী
ড. সাইয়্যেদ হাসান সেহাত
মোহাম্মদ আশিফুর রহমান
মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
ড. আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

نیوزلتر بزرگسالان
نشریه رایزنی فرهنگی سفارت ج. ا. ایران در داکا
سال ۴۳، شماره ۲، ژوئیه - اکتبر ۲۰۲۱
تیر - مرداد ، شهریور - مهر ۱۴۰۰

مدیر مسؤول وسردبیر :
دکتر سید حسن صحت
رایزن فرهنگی
سفارت جمهوری اسلامی ایران در داکا

اعضای هیئت تحریریه :
نور حسین مجیدی
عبد المقیت چودری
دکتر سید حسن صحت
محمد آصف الرحمن
محمد سعید الاسلام
دکتر عبد القدوس بادشاه

মুদ্রণ : মাল্টি লিংক প্রিন্টার্স
৬৮, ফকিরাপুল, ইসলাম ভবন (২য় তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন : ৭১৯১৮১৮, উ-সধরষ : সঁষঃরষরহশঢ়@মসধরষ.পড়স

''যতদিন পর্যন্ত না 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' ধ্বনি সমগ্র পৃথিবীতে ধ্বনিত হবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে। পৃথিবীর যেখানেই জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের সংগ্রাম সেখানেই আমরা আছি।'' -ইমাম খোমেইনী (রহ.)

সূচিপত্র

- ❖ **স্মরণীয় বাণী** ⏭ ০২
- ❖ **সম্পাদকীয়** ⏭ ০৩
- ❖ **আদর্শ** ⏭ ০৪-২৭
  - পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ও ইসলামি ঐক্য সপ্তাহ ⏭ ০৪-৬
  - **বই পরিচিতি ঃ** 'পয়গাম্বরে রহমত' শীর্ষক বই প্রকাশ ⏭ ৭
  - মহানবী (সা.)-এর বিদায় হজ এবং গাদীরে খুমের ঘটনা ⏭ ০৮-১১
  - আশুরা কোরবানির মরমি ব্যাখ্যা ⏭ ১২-১৫
  - পবিত্র আহলে বাইত ও চিরকালের কান্না ⏭ ১৬-২০
  - একটি স্বর্গীয় বিয়ে এবং বিয়ে বার্ষিকী উদযাপন ⏭ ২১-২৩
  - মানবাধিকার : ইসলামি ও পাশ্চাত্যের নিরিখ ⏭ ২৪-২৭
- ❖ **ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান** ⏭ ২৮-৪১
  - প্রেসিডেন্ট ড. রায়িসির কর্মবহুল বর্ণাঢ্য জীবন ⏭ ২৮-৩০
  - ইরানে মসজিদের সংস্কৃতি : একটি শিক্ষণীয় বাস্তবতা ⏭ ৩১-৩৪
  - বিশ্বের শীর্ষ দশ পর্যটন গন্তব্যের দেশ ইরান ⏭ ৩৫-৩৭
  - চলতি সালে খেলাধুলায় ইরানের সাফল্য ⏭ ৩৮-৪১
- ❖ **সাহিত্য** ⏭ ৪২-৫৭
  - ইরানে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পথিকৃৎ আল-রাজি ও আজকের বাস্তবতা ⏭ ৪২-৪৫
  - ইবনে সিনা : মধ্যযুগের বিশ্বসেরা চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও দার্শনিক ⏭ ৪৬-৫০
  - ইরানের আধুনিক কবি ওস্তাদ শাহরিয়ার ⏭ ৫১-৫৫
  - ফারসি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের গুরুত্ব ⏭ ৫৬
  - ফারসি পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত তথ্য আহ্বান ⏭ ৫৭
- ❖ **স্মরণীয় দিবস** ⏭ ৫৮

কিশোর নিউজলেটার সূচিপত্র

- ❖ **সাহিত্য** ⏭ ৫৯-৬৪
  - শিশু-কিশোরদের জন্য মহান আল্লাহর পরিচয় ⏭ ৫৯
  - পিতা-মাতার মর্যাদা ও তাঁদের সাথে সদাচরণের গুরুত্ব ⏭ ৬০-৬১
  - বিচক্ষণ বিচারক ⏭ ৬২-৬৩
  - ছড়া কবিতা ⏭ ৬৪

কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর
ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা
বাড়ি নং-১৭, রোড নং-৪, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫। ফোন : ৯৬১১৮৬৪, ৯৬১১৯৮৭
উ-সধরষ : ফযধশধ.রপৎড়@মসধরষ.পড়স

স্মরণীয় বাণী

- হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) এরশাদ করেন : যে কেউ জ্ঞানার্জনের জন্য কিছু সময় বিনীতভাবে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারে না সে সবসময়ই মূর্খতার লাঞ্ছনার মধ্যে পড়ে থাকবে।
- তিনি আরো এরশাদ করেন : আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সহজভাবে শিক্ষাদানকারী শিক্ষক হিসেবে উত্থিত করেছেন।
- হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) এরশাদ করেন : আমি কি তোমাদেরকে আচরণের বিচারে দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তি কারা বলে দেব? (সাহাবিগণ) বললেন : জ্বী। তিনি এরশাদ করলেন : যে ব্যক্তি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে।
- মহানবী (সা.) আরো এরশাদ করেন : ব্যক্তি যদি তার কাঁধে করে লাকড়ি বহন করে এবং তা দ্বারা স্বীয় প্রয়োজন পূরণ করে, আর স্বীয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা তা সাদাকাহ্ দেয়, এটা অন্যদের কাছে হাতপাতার চেয়ে উত্তম। কারণ, দাতার হাত গ্রহীতার হাতের চেয়ে উত্তম।
- তিনি আরো বলেন : পাকস্থলী হচ্ছে শরীরের হাউযস্বরূপ এবং রগসমূহ এর সাথে সংযুক্ত। তাই পাকস্থলী যখন সুস্থ থাকে তখন রগসমূহ সুস্থতা সরবরাহ করে এবং পাকস্থলী যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন রগসমূহ অসুস্থতা সরবরাহ করে।
- আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (আ.) এরশাদ করেন : কাজ যদিও কঠিন ও কষ্টকর, কিন্তু স্থায়ী কর্মহীনতা পাপাচার নিয়ে আসে।
- হযরত আলী (আ.) এরশাদ করেন : যে কেউ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন খাবার খায়, ভালো করে চিবিয়ে খায়, পুরোপুরি তৃপ্ত হবার আগেই খাওয়া বন্ধ করে এবং পায়খানা-প্রস্রাবের বেগ হলে বিলম্ব করে না, মৃত্যু ছাড়া সে অসুস্থ হবে না।
- হযরত ইমাম সাজ্জাদ (আ.) এরশাদ করেন : তোমার সন্তানের অধিকার এই যে, তুমি মনে রাখবে সে তোমার থেকেই এবং এ দুনিয়ায় তার ভালোমন্দ তোমার সাথে সম্পর্কযুক্ত।
- হযরত ইমাম সাজ্জাদ্ (আ.) এরশাদ করেন : যে কেউ এমন অবস্থায় ভরাপেটে নিদ্রা যায় যে, তার কাছাকাছি কোনো মু'মিন ক্ষুধার্ত থাকে তখন আল্লাহ্ বলেন : হে আমার ফেরেশতারা! আমি তোমাদেরকে আমার এই বান্দার ব্যাপারে সাক্ষী করছি যে, আমি তাকে আদেশ দিয়েছিলাম কিন্তু সে নাফরমানী করেছে ও অন্য কারো ফরমাবরদারী করেছে, তাই আমি তাকে তার আমলের ওপর রেখে দিলাম। আমার ইজ্জত ও প্রতাপের শপথ, আমি কখনোই তাকে ক্ষমা করব না।
- হযরত ইমাম বাকের (আ.) এরশাদ করেন : চারটি গুণ যে কোনো মু'মিনের মধ্যে থাকবে আল্লাহ্ তাকে বেহেশতের সমুন্নততম স্তরে সর্বোত্তম কক্ষসমূহের একটিতে ও সমুন্নততম স্থানে জায়গা দেবেন, ... : যে ব্যক্তি তার পিতা ও মাতাকে দান করবে, উভয়ের সাথে খাপ খাইয়ে চলবে, তাদের কল্যাণ করবে এবং তাদেরকে মনঃকষ্ট দেবে না।
- হযরত ইমাম বাকের (আ.) এরশাদ করেন : বিভিন্ন ধরনের জুয়া খেলাকে কোরআন মজীদে মাইসির বলে গণ্য করা হয়েছে এবং এগুলোকে শয়তানের কাজ বলে গণ্য করা হয়েছে।
- হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.)-এরশাদ করেন : তোমরা আত্মীয়-স্বজনের খোঁজখবর নাও, কেবল সালাম করার মাধ্যমে হলেও।
- হযরত ইমাম মূসা কাযেম্ (আ.) এরশাদ করেন : যে কেউ তার ভাইদের ও স্বীয় পরিবারের কল্যাণ সাধন করে তার হায়াত দীর্ঘ হয়।

(মাফাতীহুল্ হায়াত্ গ্রন্থ থেকে সংকলিত)
অনুবাদ : নূর হোসেন মজিদী

নূরের জন্মোৎসব

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٦﴾

'হে নবী! অবশ্যই আমি আপনাকে (লোকদের জন্য) সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী ও আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী হিসেবে এবং জ্যোতির্ময় প্রদীপরূপে প্রেরণ করেছি।' (সূরা আল-আহযাব : ৪৫-৪৬)

এতে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই যে, কোনো মানুষের পক্ষেই হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর সমুন্নত ব্যক্তিত্বের সকল দিক বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কারণ, এ মহান রাসূলের ব্যক্তিত্বের দিকসমূহ বুঝার জন্য মানুষের সক্ষমতা খুবই সীমিত। তাই আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল্ 'আলামীনের নির্বাচিত এ শ্রেষ্ঠতম নবী ও রাসূল সম্পর্কে ইতিহাস থেকে যা জানতে পেরেছি তা কেবলই এ মহান ব্যক্তিত্বের অভ্যন্তরীণ ও প্রকৃত সত্তার একটি ছায়া মাত্র। তবে আমাদের জন্য তাঁর এ পরিচয়টুকুই যথেষ্ট। কারণ, প্রথমত, এ থেকেই আমরা তাঁকে আমাদের জন্য পরিপূর্ণ অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে পাচ্ছি। দ্বিতীয়ত, এর ফলে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে কেন্দ্র করে ইসলামি ঐক্যে উপনীত হতে সক্ষম। সুতরাং আমাদের মুসলমানদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক এবং তাঁর জীবন, সীরাত, চরিত্র ও আচরণ এবং সমুন্নত শিক্ষাসমূহের সাথে গভীরভাবে পরিচিত হওয়া অপরিহার্য।

বস্তুত ইসলামের সবচেয়ে বড় প্রচার এটাই যে, আমরা বিশ্ববাসীর সামনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরব, আর এটাই প্রকৃত রাসূলপ্রেমের দাবি। কারণ, তাহলে মানুষের মন রাসূলুল্লাহ্‌র প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, সাম্প্রতিক কালে ইসলামি জাহানে এমন কতক ইফরাতী (উগ্রপন্থী) ফিরকা ও ধারা আত্মপ্রকাশ করেছে যারা আল্লাহর দ্বীন ইসলাম ও রাহ্‌মাতুল্লিল 'আলামীন রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে ভুল পরিচয় তুলে ধরছে এবং ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের সমার্থকে পর্যবসিত করেছে; বস্তুত এটাই আজ ইসলাম ও রাসূলুল্লাহর মযলূম হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ মূলগতভাবেই ইসলাম ও রাসূলুল্লাহর সমুন্নত শিক্ষা ও চারিত্রিক বিধানে ইফরাত (উগ্রপন্থা) ও সন্ত্রাসের, যেমন : আত্মঘাতী হামলা, নিরপরাধ মানুষ হত্যা, শিরশ্ছেদ ইত্যাদির ন্যায় নিষ্ঠুরতার কোনো স্থান নেই।

আজকের দিনে মানব প্রজাতি মুক্তি ও সফলতার তীরে উপনীত হওয়ার জন্য ইসলামি সচেতনতা এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিক, তাঁর চারিত্রিক শিক্ষা, রাষ্ট্রপরিচালনা পদ্ধতি, রাষ্ট্রীয় নীতিমালা, জনকল্যাণ, ইবাদত-বন্দেগি, জিহাদ ও বিশেষ শিক্ষার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি মুখাপেক্ষী। কারণ, বর্তমানে দু'টি পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্‌র প্রতি হামলা চালানো হচ্ছে :

প্রথমত, মাযহাবী উগ্রপন্থার অনুসরণকারীরা – যারা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত তাৎপর্য গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয়ত, বৈশ্বিক দাম্ভিক বৃহৎ শক্তিবর্গ – যারা ইসলামি সচেতনতা ও জাগরণ এবং মুসলমানদের ঐক্যকে ভয় পাচ্ছে।

ইসলামি ঐক্য

বস্তুত ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব হচ্ছে সুন্দরতম পরিভাষাসমূহের অন্যতম। পূর্ববর্তী সমস্ত নবী-রাসূলের (আ.) আদর্শের ধারাবাহিকতায় হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) মানবসমাজকে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা উপহার দিয়েছেন। আর এটা অনস্বীকার্য যে, মুসলমানদের জন্য ঐক্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। কারণ, ইসলামের দুশমনরা তাদের বিখ্যাত সর্বজনজ্ঞাত 'ভাগ কর ও শাসন কর' ঔপনিবেশিক নীতির ভিত্তিতে সব সময়ই মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভক্তি সৃষ্টি করে তা থেকে সুবিধা হাসিল করে আসছে।

বিগত এক শতাব্দী কাল যাবৎ সারা বিশ্বের ওলামায়ে ইসলাম ও ইসলামি চিন্তাবিদগণ ইসলামি ঐক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে আসছেন। এটা অনস্বীকার্য যে, মুসলমানদের বিভিন্ন মাযহাব ও ফিরকার মধ্যে আকায়েদের কতক শাখা-প্রশাখা ও কতক ফিকহী বিষয়ে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা আকায়েদের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়গুলোতে এবং অনেক বেশি ফিকহী বিষয়ে অভিন্নতার অধিকারী। তাই তাঁরা ইসলামের বিপজ্জনক দুশমনদের মোকাবিলায় পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়ে ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা করে আসছেন। আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মজীদে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন : وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا – 'তোমরা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র রশি আঁকড়ে ধর এবং বিভক্ত হয়ো না।' সুতরাং অনস্বীকার্য যে, ইসলামের ঘোরতর দুশমনদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়ার চাবিকাঠি মুসলমানদের ঐক্য ও দূরদর্শিতার মধ্যে নিহিত। এ বিষয়টি সামনে রেখেই, যেহেতু ১২ ও ১৭ই রবিউল আউয়াল যথাক্রমে আহলে সুন্নাত ও আহলে বাইতের মাযহাব মতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মদিন সেহেতু ইরানের ইসলামি বিপ্লবের মহান নেতা হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) বিপ্লবের বিজয়ের পর পরই যথার্থভাবেই ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে ১২ থেকে ১৭ই রবিউল আউয়ালকে 'ইসলামি ঐক্য সপ্তাহ' হিসেবে ঘোষণা করেন এবং তখন থেকেই প্রতি বছর বিশ্বের মুসলমানরা এ সপ্তাহটি উদ্‌যাপন করে ইসলামের অন্তর্দৃষ্টির আলোকে নিজেদের মধ্যকার অনৈক্য ও বিভক্তিকে পাশে সরিয়ে রেখে ইসলামের দুশমনদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে আসছে।

সবশেষে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে, ইসলামি জাহানের ঐক্যের আহ্বায়নকারী হিসেবে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান মাজ্‌মা'এ জাহানীয়ে তাক্বরীবে মাযাহেবে ইসলামি (ইসলামি মাযহাবসমূহের ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টিকারী বৈশ্বিক সংস্থা)-এর মাধ্যমে প্রতি বছর তেহরানে আন্তর্জাতিক ইসলামি ঐক্য সম্মেলনের আয়োজন করে আসছে – যা সারা বিশ্বে ইসলামি মাযহাবসমূহের ওলামা ও চিন্তাবিদগণের বৃহত্তম সমাবেশ।

আমরা হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর মহান জন্মদিন কেন্দ্রিক ঈদে মীলাদুন্নবী ও ইসলামি ঐক্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে এবং একই সাথে আহ্‌লে বাইতের ধারাবাহিকতার ষষ্ঠ ইমাম হযরত জা'ফর সাদেক (আ.)-এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি ও বিশেষভাবে নিউজলেটারের পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমাদের প্রত্যাশা এই যে, এ মহান সপ্তাহে ইসলামি জাহানের ঐক্য অতীতের চেয়েও অধিকতর সুদৃঢ় হবে এবং আমরা সকলেই যথাযথভাবে আমাদের দ্বীনী দায়িত্ব পালনে সক্ষম হব, ইন শাআল্লাহ।

মোহাম্মাদ রেযা নাফার
বাংলাদেশে নিয়োজিত ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত
সাইয়্যেদ হাসান সেহাত
বাংলাদেশে নিয়োজিত ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের কালচারাল কাউন্সেলর

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ও ইসলামি ঐক্য সপ্তাহ

ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) হলেন সর্বশেষ ও বিশ্বনবী। একজন মানুষ হিসেবেও তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহামানব– রাহমাতুল্লিল 'আলামীন। তাঁর পবিত্র পয়গাম কোনো বিশেষ জাতি বা ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না বা নয়। পৃথিবীতে তাঁর আগমন হয়েছিল বিশ্বব্যাপী সকল মানুষের কল্যাণের জন্য। শ্রেষ্ঠতম মানব মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর স্বীকৃতি কেবল পবিত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআন, হাদিস বা মুসলিম মনীষীদের ভাষ্য দ্বারাই স্বীকৃত নয়; বরং বিশ্ববরেণ্য অমুসলিম পণ্ডিত ও মহান ব্যক্তিরাও তাঁকে মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন। কেবল একজন ধর্ম প্রচারক হিসেবে নয়, একজন ব্যক্তি মানুষ হিসেবে অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, শিষ্টাচার, সত্যনিষ্ঠা, তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, রাষ্ট্র পরিচালনায় অনন্য দক্ষতা, মানবতাবাদী চিন্তা দর্শন এবং পরধর্ম সহিষ্ণুতা ইত্যাদি মানবীয় গুণাবলির অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে ফরাসি লেখক আলফ্রেড দ্য ল্যামারটাইন, বীরযোদ্ধা নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, পাদ্রি বচওয়ার্থ স্মিথ, স্টিফেন, আলফ্রেড টয়েনবী, ঐতিহাসিক এইচ আর গিবন, থমাস কার্লাইল, জর্জ বার্নার্ড শ, আলবার্ট জনসন প্রমুখ অমুসলিম পাশ্চাত্য মনীষিগণও মহানবী (সা.)-এর প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন। মহানবীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সহমত পোষণকারী ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, স্যার পিসি রাম, স্বামী বিবেকানন্দ, সরোজনী নাইডু, এনি এ বোসান্ত, এম এন রায়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের নামও প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক লেখক মাইকেল এইচ হার্ট তাঁর সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ *দি হান্ড্রেড*-এ পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ যে ১০০ জন মনীষীর জীবনী সংযুক্ত করেছেন সেখানে তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে শীর্ষতম স্থান দিয়েছেন।

মুসলিম জাতির কাছে ১২ রবিউল আউয়াল দিনটি অত্যন্ত পবিত্র ও বরকতময় দিন। কারণ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রসিদ্ধ মতে, মহিমান্বিত এই দিনেই (৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট) হযরত মুহাম্মাদ (সা.) জন্মগ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য যে, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জন্ম মানব ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাঁর জন্মদিনটি মুসলিম জাতির জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাই এ মহিমান্বিত দিনে গোটা পৃথিবীর মুসলিম সমাজ যে ধর্মীয় উৎসব ও আচারের মাধ্যমে বিশেষভাবে আনন্দ প্রকাশ ও মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাঁদের সালাম ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করে থাকেন– যা 'ঈদে মিলাদুন্নবী' নামে পরিচিত। আভিধানিক অর্থে এই ঈদ অর্থ হুজুর পাক (সা.)-এর পবিত্র 'বেলাদত শরিফ' উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করা।

বর্তমানে বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদা এবং ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এইদিন ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ মসজিদে মসজিদে, নিজ নিজ বাড়িতে কুরআন খতম ও জিকির আজগারের মাধ্যমে মহান রাব্বুল 'আলামীনের বিশেষ রহমত কামনা করেন। এইদিনে বিশেষ আলোচনা সভা ও সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে মহানবীর জীবনচরিত আলোচনা করে ও এর আলোকে নিজেদের জীবন গঠনের অঙ্গিকার করা হয়। ঈদে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন কর্মসূচিতে জশনে জুলুস, বিশেষ দোয়া ও মিলাদ মাহফিল ইত্যাদির আয়োজনও থাকে। মহানবী (সা.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে সরকারি ছুটি প্রদান করা হয়। ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রিন্ট মিডিয়ায় ক্রোড়পত্র প্রকাশসহ প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় দিবসটির গুরুত্ব তুলে ধরে বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়।

২

বর্তমান বিশ্বে মুসলমান সমাজ নানামুখী বিপদ ও দুরবস্থার মধ্যে আছে। মুসলিম বিশ্ব আজ ক্ষতবিক্ষত। তাদের এ দুরবস্থার অন্যতম কারণ হলো নিজেদের মধ্যকার বিভেদ ও অনৈক্য। মুসলমানদের মাঝে আজ নানা বিভক্তি বিরাজমান। অথচ সমগ্র মুসলমান এক

জাতি। তাদের লক্ষ্য এক। ঈমানের পর ঐক্য ও একতাকে মুসলিম জাতির উপর আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বড় নিয়ামত বলে গণ্য করা হয়। আর বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা হলো তাদের জন্য সবচেয়ে বড় শাস্তি। আর এ কারণেই মহাপবিত্র আল কুরআনে আল্লাহ মুসলিমদের বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হওয়ার পরিবর্তে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে ঐক্যবদ্ধ থাকতে এবং নিজেদের মধ্যে বিভেদ না করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (সূরা আল ইমরান, আয়াত : ১০৩)। মুসলিমগণ যেন বিভেদ সৃষ্টি না করে রাসূলের আনুগত্য করেন পবিত্র কুরআনে সে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নতুবা মুসলমানদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি হারিয়ে তারা শত্রুদের চোখে হেয় প্রতিপন্ন হবে বলেও আল্লাহ পাক সতর্ক করে দিয়েছেন। (সূরা আল আনফাল, আয়াত : ৪৬)। বিশ্বনবী (সা.) নিজেও এ বিষয়ে তাঁর উম্মতদের করণীয় নির্দেশ করে গেছেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ এক এবং তিনি ঐক্য বা একতা পছন্দ করেন। (Allah is unity, and likes unity.) এরূপ আরো অনেক হাদিস রয়েছে যেখানে মানব জাতি তথা মুসলমানদের মধ্যকার ঐক্যের কথা বলা হয়েছে এবং জাতিগত বৈষম্য কঠোরভাবে ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনৈক্যের ক্ষতি এবং ঐক্যের গুরুত্ব ও কল্যাণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাসূলে করিম (সা.) বলেছেন, 'তোমরা অনৈক্য থেকে দূরে থাকবে। একাকী থাকা অবস্থায় ভেড়া যেভাবে বাঘের শিকার হয়, তেমনি একাকী অবস্থানরত ব্যক্তিকে শয়তান ঘেরাও করে ফেলে।'

কিন্তু মুসলিম সমাজ কুরআন-হাদিসের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদের দেয়াল তৈরি করেছে। মুসলমানদেরকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য মুসলমানদের শত্রুরাও মুসলমানদেরকে একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। শিয়া-সুন্নি ভেদাভেদ ও মাজহাবি বিতর্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের মাঝে বিদ্বেষ উস্কে দিয়ে অনৈক্যকে দৃঢ়মূল করে তুলছে। ছোট-খাট বিষয় নিয়েও মুসলিম সমাজ অহেতুক বিতর্ক ও বিরোধে জড়িয়ে পড়ছে। মুসলিম সমাজের এ অনৈক্যের সুযোগ নিচ্ছে অমুসলিম বিশেষ করে পশ্চিমা দুনিয়া।

বিশ্বনবী (সা.)-এর পর ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে মুসলিম উম্মাহর সর্বজনমান্য অন্য মহাপুরুষ বা ধর্মীয় নেতারাও মুসলিম বিশ্বে বিরাজমান এহেন মত-বিরোধ, বিভেদ-বিভক্তি, তিক্ততা-রেষারেষি, হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা-ঘৃণা প্রভৃতি দূরীভূত করে তাদেরকে সুসম্পর্ক ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করার লক্ষ্যে নানাভাবে ভূমিকা রেখেছেন। তাঁরা ইসলামি ঐক্য ও সহিষ্ণুতার দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন। মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ও সংহতি বিনির্মাণে যেসব মহৎপ্রাণ ব্যক্তি অবদান চিরস্মরণীয় তাঁদের মধ্যে হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল্-উয্মা রুহুল্লাহ্ আল্-মুসাভী ইমাম খোমেইনী (রহ.) ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন ইরানের সফল ইসলামি বিপ্লবের মহান নায়ক ও ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। একজন প্রাজ্ঞ দার্শনিক, রাষ্ট্রচিন্তক ও রাজনীতিজ্ঞ, আপোসহীন বিপ্লবী, একজন উঁচুমানের শিক্ষক, হৃদয়স্পর্শী বক্তা এবং সর্বোপরি একজন অনন্যসাধারণ আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে তিনি বিশ্বময় স্বীকৃত। জগৎ বিখ্যাত *দ্যা টাইমস*

ম্যাগাজিন ১৯৭৯ সালে তাঁকে 'Man of the year' নির্বাচন করেছিল।

মুসলমানদের মধ্যকার ঐক্য, শান্তি ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য ইমাম খোমেইনী (রহ.) যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন এর অন্যতম ছিল পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে ১২-১৭ রবিউল আউয়াল পর্যন্ত প্রতিবছর মুসলমানদের জন্য 'ঐক্য সপ্তাহ' পালনের ঘোষণা প্রদান। মহান ইসলামি বিপ্লব সফল হওয়ার বিপ্লবের প্রাণপুরুষ মহান ইমামের নির্দেশে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানে 'ঐক্য সপ্তাহ' শুরু হয়। ইমাম খোমেইনী (রহ.) ঐক্য, শান্তি ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানদের বিভিন্ন মাজহাব ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংলাপে বিশ্বাসী ছিলেন। মাজহাবী বিতর্ক তথা শিয়া-সুন্নি বিরোধ মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ও প্রগতির পথে একটি শক্ত প্রাচীর হিসেবে কাজ করছে। এ বিরোধকে জিইয়ে রেখে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের দোসররা নানাভাবে তাদের স্বার্থ হাসিলের চেষ্টারত। মুসলিম উম্মাহর জন্য এ ক্ষতিকর দিক উপলব্ধি করে ইমাম খোমেইনী (রহ.) শিয়া-সুন্নি ও অন্যান্য মাজহাবগত ফেরকা বা বিভেদের উর্ধ্বে গোটা মুসলিম জনসমাজকে ঐক্যবদ্ধকরণে আত্মনিয়োগ করেন। মাজহাবী মতপার্থক্য সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহ যেন ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য পরস্পরকে সমর্থন, সাহায্য ও সহযোগিতা করে এবং পারস্পরিক মতপার্থক্যকে এতদূর নিয়ে না যায়– যা থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুরা লাভবান হবে– সে লক্ষ্যে মহান ইমাম সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করেন। ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে ইসলামি ঐক্য সপ্তাহের আয়োজনের পিছনেও এই উদ্দেশ্য ছিল।

ইসলামি বিপ্লবোত্তর ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে প্রতিবছর ইসলামি ঐক্য সপ্তাহ পালিত হয়। এতদউপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে প্রতিবছর মুসলিম বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ এবং এর বাইরেও ইউরোপ ও আমেরিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিনিধিগণ অংশ নেন। ২০১৮ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত ৩২তম ঐক্য সম্মেলনে বর্তমান নিবন্ধকার নিজেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। সে সম্মেলনে শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে তিন শতাধিক প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিলেন। এ বছর (২০২১ সালে) ১৯ থেকে ২৪ অক্টোবর তেহরানে অনুষ্ঠিত হয় ৩৫তম ইসলামি ঐক্য সম্মেলন। সম্মেলনটি উদ্বোধন করেন ইরানের নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সাইয়্যেদ ইব্রাহিম রায়িসি। প্রেসিডেন্ট তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় পারস্পরিক মতানৈক্য ও বিরোধ পরিহার করে মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ও সংহতি জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এবারের ইসলামি ঐক্য সম্মেলনে মুসলিম বিশ্বের প্রায় চারশ' প্রতিনিধি অংশ নেন। ইসলামি ঐক্য সম্মেলনে একত্রিত হয়ে মুসলিম বিশ্বের প্রসিদ্ধ শিয়া ও সুন্নি, আলেম, পণ্ডিত ও চিন্তাবিদরা মুসলিম বিশ্বের সর্বশেষ ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনা করেন এবং মুসলিমদের মাঝে সংহতি জোরদার করার পথ প্রশস্তকরণে দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ দেন।

আমরা বর্তমানে এক অস্থির পৃথিবীতে বাস করছি। বিশ্বায়ন এবং তথ্য প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। মুসলিম বিশ্ব আজ অনৈক্যের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। নব্য সাম্রাজ্যবাদের কবলে পড়ে আফ্রিকার তিউনিসিয়া, মিশর, লিবিয়া এবং এশিয়ার সিরিয়ার, ইরাক, ইয়ামেন ও আফগানিস্তান আজ গৃহযুদ্ধের আগুনে দগ্ধিভূত হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীদের মদদপুষ্ট হয়ে একদল বিভ্রান্ত লোক ইসলামের নামে সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বিশ্বদরবারে মুসলমানদের জঙ্গি হিসেবে পরিচিত করানোর অপচেষ্টা করছে। এ থেকে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশও আজ আর মুক্ত নেই। আমরা এ অবস্থার পরিবর্তন চাই। এর জন্য প্রয়োজন কুরআনের নির্দেশনা এবং মহানবীর জীবনাদর্শ চর্চা এবং অনুসরণের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, বিশ্ব শান্তি ও সংহতির লক্ষ্যে কাজ করা।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা পোষণ করা ইমানের পূর্বশর্ত। এটি আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসাপ্রাপ্তির একমাত্র মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ ইমানদার হবে না যতক্ষণ তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সব মানুষের চেয়ে আপন আর বেশি প্রিয় না হই।' তিনি আরও বলেছেন, 'মহান আল্লাহ তোমাদের নিয়ামত দান করেন সেজন্য তোমরা তাঁকে ভালোবাসবে আর তাঁর মহব্বত পাওয়ার জন্য তোমরা আমাকে ভালোবাসবে।' পবিত্র কুরআনুল কারিমের সূরা আলে ইমরানের ৩১ ও ১৩২ নং আয়াতেও এ বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশনা রয়েছে। মহানবী (সা.)-কে ভালোবাসা মানে হলো তাঁর জীবনাদর্শকে অনুসরণ করা। আর মহানবী (সা.) হলেন উত্তম জীবনাদর্শের অধিকারী। এই আদর্শের যথার্থ অনুসরণ, প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইহ ও পারলৌকিক মুক্তি অর্জনের চেষ্টা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসা এবং তাঁর সুপারিশ লাভের জন্য তাঁর নির্দেশিত পথে চলার পাশাপাশি অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পারস্পরিক সংঘাত, বিভেদ ও অনৈক্য পরিহার করে রাসূলের আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা হোক আমাদের প্রত্যয়। আজকের বিশ্ববাস্তবতায় এটিই ঈদে মিলাদুন্নবীর বড় শিক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

লেখক : অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

‘পয়গাম্বরে রহমত’ শীর্ষক বই প্রকাশ

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ও ইসলামি ঐক্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে গত ২৪ অক্টোবর রোববার ‘পয়গাম্বরে রহমত’ শীর্ষক একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে ইসলামি বিপ্লবের মহান নেতা হযরত আয়াতুল্লাহ আল উজমা খামেনেয়ী (মুদ্দাযিল্লুহু)-এর বয়ান সংকলন।

এটি বঙ্গানুবাদ করেছেন ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর ড. সাইয়্যেদ হাসান সেহাতের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত বইটির সম্পাদনায় ছিলেন ড. এম আব্দুল কুদ্দুস বাদশা। এটি প্রকাশ করেছে সূচীপত্র প্রকাশনী।

বিশ্ববাসীর জন্য রহমতের বার্তা নিয়ে আগমন করেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। মানবের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য তিনি যে ঐশী জীবন-দর্শন উপস্থাপন করেন, আজকের বিশ্বমানব তা থেকে বহু ক্রোশ দূরে। ফলশ্রুতিতে জাতিতে জাতিতে হানাহানি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অশান্তি আর রক্তপাত যেন থামছেই না। প্রমাণ হয়েছে বিশ্বমানবকে ফিরে যেতে হবে বিশ্বশান্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আনীত সেই শান্তিময় জীবন ধারায়। তাই সময়ের চাহিদা ও পরিস্থিতিকে সামনে রেখে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে গোটা মানবজাতির কাছে ইসলামের মহান পয়গাম্বরের জীবনদর্শনকে নতুন বিশ্লেষণে উপস্থাপন করা খুবই অত্যাবশ্যক। ইরানের ইসলামি বিপ্লবের বিদগ্ধ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী (হাফা.) তাঁর গভীর প্রজ্ঞা এবং মুসলিম জাতির নেতৃত্ব প্রদানের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন বয়ানে মহানবী (সা.) সম্পর্কে বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন, যেগুলো স্থান পেয়েছে এই সংকলনে। বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম এই বইয়ের মধ্যে খুঁজে পাবে তাদের মনের খোরাক।

উল্লেখ্য, হযরত আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী ইউরোপ ও আমেরিকার তরুণদের উদ্দেশে লেখা পত্রে কুরআন ও পয়গাম্বরে ইসলামকে চেনার ব্যাপারে যে গুরুত্বারোপ ও সুপারিশ করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামি বিপ্লবের সাংস্কৃতিক গবেষণা ফাউন্ডেশনের আন্তর্জাতিক অধিদপ্তর মহামান্য রাহবারের লেখা, বক্তব্য ও ভাষণসমূহ সংগ্রহ এবং শিরোনাম ও অধ্যায় আকারে সাজানোর কাজ হাতে নেয়। উক্ত ফাউন্ডেশনের মূল দায়িত্ব হচ্ছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসলামি বিপ্লবের মহান নেতার বক্তব্য, রচনা ও চিন্তাধারার প্রচার প্রসার করা।

এ ক্ষেত্রে ১৩৮৫ ফারসি সালে তরুণ সমাজের পক্ষ হতে ‘নাইয়েরে আজম’ শিরোনামে যে বইটি ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে রচিত ও মুদ্রিত হয়েছে তা থেকে বিরাটভাবে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং সময়ের চাহিদা ও পরিস্থিতিকে সামনে রেখে অমুসলিমদের, বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের জনগণের উদ্দেশে ইসলামের মহান পয়গাম্বরের জীবনের ঘটনাপ্রবাহ ও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার আলোকে সর্বশেষ তথ্যগুলোও সন্নিবেশিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এমনকি ১৪৪২ হিজরি সালের ২৭ রজব মোতাবেক ২১ ইসফান্দ ১৩৯৯ ফারসি সালে (২০২০খ্রি) রাসূলে আকরামের নবুওয়াত লাভের যে বার্ষিকী পালিত হয় তাতে মহামান্য রাহবার যে বয়ান পেশ করেন সেটিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখন বইটি নতুন ও পরিবর্তিত বিন্যাসে ও কলেবরে মুদ্রিত হলো।

মহানবী (সা.)-এর বিদায় হজ এবং গাদীরে খুমের ঘটনা

সংকলন : মোহাম্মদ আশিফুর রহমান

ইসলামের সামষ্টিক ইবাদতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও আড়ম্বরপূর্ণ ইবাদত হলো হজ। প্রতি বছর সামর্থ্যবান মুসলমানরা যিলহজ মাসে তাঁদের এ ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের জন্য পবিত্র মক্কা নগরীতে আগমন করেন। হজ এমন একটি সমাবেশ যেখানে মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্য ও সাম্যের বাস্তব নমুনাই কেবল প্রকাশিত হয় তা নয়; বরং এর মাধ্যমে মুসলমানদের আন্তঃসম্পর্কও দৃঢ় হয়।

হযরত ইবরাহীম (আ.) পবিত্র কাবার ভিত্তি পুনঃনির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে মহান আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে এ ঘর যিয়ারত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেদিন থেকে এ অঞ্চল কাবা ও তাওয়াফের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। প্রতি বছর পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ এ ঘর যিয়ারত করার জন্য ছুটে আসে এবং যে আচার-অনুষ্ঠান হযরত ইবরাহীম (আ.) শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা সম্পন্ন করে। কিন্তু কালক্রমে মহান নবিগণের নেতৃত্ব-ধারা থেকে হিজাযবাসী বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কুরাইশদের স্বেচ্ছাচারিতা এবং সমগ্র আরব বিশ্বের চিন্তাজগতের ওপর প্রতিমাগুলোর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার কারণে হজের আচার-অনুষ্ঠানও স্থান-কালের দৃষ্টিকোণ থেকে বিকৃত হয়ে যায় এবং সত্যিকার খোদায়ী রূপ হারিয়ে ফেলে।

এসব কারণেই মহানবী (সা.) হিজরতের দশম বর্ষে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিষ্ট হন যে, তিনি নিজে ঐ বছর হজ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে মুসলিম উম্মাহ্‌কে ব্যবহারিকভাবে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্যের সাথে পরিচিত করাবেন এবং উপরিউক্ত কারণসমূহের জন্য এ হজকে কেন্দ্র করে যেসব বিকৃতির উদ্ভব ঘটেছিল, সেগুলোর মূলোৎপাটন করবেন এবং জনগণকে আরাফাত ও মিনার সীমানা এবং ঐসব স্থান থেকে বের হবার সঠিক সময়ও শিখিয়ে দেবেন।

মহানবী (সা.) ইসলামি বর্ষপঞ্জির একাদশ মাস অর্থাৎ যিলকদ মাসে ঘোষণা করেন যে, তিনি ঐ বছর মহান আল্লাহ্‌র ঘর যিয়ারত করতে যাবেন। এ ঘোষণা মুসলমানদের এক বিরাট অংশের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে এবং এর ফলে হাজার হাজার মানুষ মদীনার চারপাশে তাঁবু স্থাপন করে মহানবীর হজযাত্রার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

মহানবী (সা.) ২৬ যিলকদে আবু দুজানাকে মদীনায় নিজের স্থলবর্তী নিযুক্ত করে ৬০টি কুরবানির পশু সাথে নিয়ে পবিত্র মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যান। তিনি যূল হুলাইফায় পৌঁছে দু'টি সেলাইবিহীন বস্ত্র পরে 'মসজিদে শাজারাহ্' থেকে ইহ্‌রাম করেন এবং ইহ্‌রাম করার সময় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আহ্বানে সাড়া দানস্বরূপ প্রসিদ্ধ দুআ– লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক... পাঠ করেন। আর যখনই তিনি কোনো বহনকারী পশু (সওয়ারী) দেখতে পেয়েছেন বা উঁচু বা নিচু স্থানে উপনীত হয়েছেন, তখনই তিনি 'লাব্বাইকা' বলেছেন। যিলহজ মাসের ৪ তারিখে তিনি পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন এবং সরাসরি মসজিদুল হারামের পথ ধরে এগিয়ে যান। তিনি বনী শাইবার ফটক দিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন। ঐ অবস্থায় তিনি মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছিলেন এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ওপর দরুদ পাঠ করছিলেন।

তাওয়াফের সময় তিনি হাজরে আসওয়াদের (কালো পাথর) নিকটে গিয়ে প্রথমে একে স্পর্শ করেন এবং এর উপর হাত বুলান এবং পবিত্র কাবা সাত বার তাওয়াফ করেন। এরপর তিনি মাকাম-ই ইবরাহীমের পশ্চাতে গিয়ে দু' রাকাআত তাওয়াফের নামায আদায় করেন। তিনি নামায সমাপ্ত করে সাফা-মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করেন। অতঃপর তিনি হাজীদের উদ্দেশে বলেন : 'যারা নিজেদের সাথে কুরবানির পশু আনে নি, তারা ইহ্‌রাম ত্যাগ করবে এবং তাকসীর (অর্থাৎ চুল ছাটা বা নখ কাটা) করার মাধ্যমে তাদের জন্য

ইহ্‌রামকালীন হারাম হয়ে যাওয়া বিষয়গুলো হালাল হয়ে যাবে। তবে আমি এবং যারা নিজেদের সাথে কুরবানির পশু এনেছে, তারা অবশ্যই ইহ্‌রামের অবস্থায় থাকবে ঐ সময় পর্যন্ত, যখন তাদের কুরবানির পশুগুলোকে তারা কুরবানি করবে।'

হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরু

উমরার আমলসমূহ সমাপ্ত হয়। উমরা ও হজের আমলসমূহ শুরু হওয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সময় কারো কাবায় (মসজিদুল হারাম ও মক্কা নগরীতে) অবস্থান করার ব্যাপারে মহানবী (সা.) সম্মত ছিলেন না। তাই তিনি মক্কার বাইরে তাঁর তাঁবু স্থাপন করার নির্দেশ দিলেন।

৮ যিলহজ বাইতুল্লাহ্‌ যিয়ারতকারিগণ পবিত্র মক্কা নগরী থেকে আরাফাতের ময়দানের দিকে যাত্রা শুরু করেন, যাতে তাঁরা ৯ যিলহজ দুপুর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করতে পারেন। মহানবী (সা.) ৮ যিলহজ মিনার পথে আরাফাতের ময়দানের দিকে যাত্রা করেন এবং ৯ যিলহজের সূর্যোদয় পর্যন্ত তিনি মিনায় অবস্থান করেন। এরপর তিনি নিজ উটের উপর সওয়ার হয়ে আরাফাতের পথে অগ্রসর হন এবং 'নামিরাহ্‌'-এ অবতরণ করেন। উল্লেখ্য, এ স্থানেই মহানবী (সা.)-এর জন্য তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল। ঐ মহতী মহাসমাবেশে মহানবী (সা.) উটের পিঠে আসীন অবস্থায় তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। আর এ ঐতিহাসিক ভাষণই 'বিদায় হজের ভাষণ' নামে খ্যাতি লাভ করে।

বিদায় হজে মহানবী (সা.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ

মহানবী (সা.) আরাফাতের ময়দানে এক লক্ষ মানুষের সাথে যুহর ও আসরের নামায আদায় করেন। এরপর তিনি উটের পিঠে আরোহণ করে ঐ দিন তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও উচ্চকণ্ঠের অধিকারী তাঁর সাহাবীরা তাঁর ভাষণ পুনরাবৃত্তি করে দূরবর্তী লোকদের কর্ণগোচর করেছিলেন।

মহানবী (সা.) তাঁর এ ভাষণে প্রথমেই নিজের পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার ইঙ্গিত দেন। এরপর তিনি মুসলমনাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেন। প্রতিটি মুসলমানের ধন-সম্পদ ও জীবন সম্মানিত বলে ঘোষণা করেন। জাহেলিয়াতের যুগে যেসব রক্ত ঝরানো হয়েছে সেগুলোর প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বলেন। আমানত তার প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। সুদকে হারাম করেন। অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। বারো মাসের মধ্যে যিলকদ, যিলহজ, মুহররম এবং রজব– এ চারটি মাসকে মহান আল্লাহ্‌ হারাম করেছেন বলে ঘোষণা করেন। স্ত্রীদের অধিকারের দিকে খেয়াল রাখতে বলেন। পথভ্রষ্টতা থেকে দূরে থাকার জন্য আল্লাহর কিতাব ও নিজ আহলে বাইতকে আঁকড়ে ধরার কথা বলেন।

১০ যিলহজ মহানবী মিনার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন এবং কঙ্কর নিক্ষেপ, কুরবানি এবং তাকসীর ইত্যাদি সম্পন্ন করে হজের অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান ও কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য পবিত্র মক্কা গমন করেন। আর এভাবে তিনি জনগণকে হজের আচার-অনুষ্ঠান এবং বিধানসমূহ শিক্ষা দেন।

হাদীসবিদগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে এই যে, মহানবী (সা.) আরাফাতের দিবসে (৯ যিলহজ) তাঁর এ ভাষণ প্রদান করেছিলেন। তবে কতিপয় মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন, মহানবী (সা.) ১০ যিলহজ এ ভাষণ দিয়েছিলেন। আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৪

গাদীরে খুমের মহাঘটনা

হজের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলো। মুসলমানরা মহানবীর কাছ থেকে হজের আমলসমূহ শিখে নেন। এ সময় মহানবী পবিত্র মদীনার উদ্দেশে পবিত্র মক্কা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। মদীনা অভিমুখে যাত্রার নির্দেশ দেওয়া হলো। কাফেলাসমূহ জুহ্‌ফার তিন মাইলের মধ্যে অবস্থিত 'রাবুঘ' নামক স্থানে পৌঁছলে ওহীর ফেরেশতা হযরত জিবরাইল আমীন (আ.) 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে একটি আয়াত নিয়ে অবতরণ করেন। আয়াতটি হলো :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ

আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার করুন; আর যদি আপনি তা না করেন, তা হলে আপনি তাঁর রিসালাতই (যেন) প্রচার করেন নি এবং মহান আল্লাহ্ আপনাকে জনগণের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করবেন।... (সূরা মায়েদাহ্ : ৬৭)

মহানবী (সা.) যাত্রা বিরতির নির্দেশ দিলেন। যাঁরা কাফেলার সম্মুখভাগে ছিলেন তাঁদেরকে থামানো হলো এবং যাঁরা কাফেলার পেছনে ছিলেন তাঁরা এসে তাঁদের সাথে মিলিত হলেন। সেদিন দুপুর বেলা তীব্র গরম পড়েছিল। জনতা তাদের বহিরাবরণের একটি অংশ মাথার উপর এবং আরেকটি অংশ পায়ের নিচে রেখেছিল। মহানবী (সা.)-এর জন্য একটি শামিয়ানা তৈরি করা হলো। তিনি জামাআতে যুহরের নামায আদায় করলেন। এরপর জনতা তাঁর চারপাশে সমবেত হলে তিনি একটি উঁচু জায়গার উপর গিয়ে দাঁড়ালেন যা উটের হাওদা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ভাষণ দিলেন।

গাদীরে খুমে মহানবী (সা.)-এর ভাষণ

মহানবী (সা.) প্রথমে মহান আল্লাহ্র একত্ববাদের সাক্ষ্য দেন, তাঁর প্রশংসা করেন এবং যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় কামনা করেন। তিনি তাঁর উপর অর্পিত রিসালাতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছেন কিনা সে ব্যাপারে উপস্থিত জনতা হতে সাক্ষ্য গ্রহণ করেন।

এরপর মহানবী (সা.) সকলকে জিজ্ঞাসা করেন : 'তোমরা কি সাক্ষ্য দেবে যে, বিশ্বজগতের মাবুদ এক-অদ্বিতীয় এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রাসূল; পরকালে বেহেশত, দোযখ এবং চিরস্থায়ী জীবনের ব্যাপারে কোনো দ্বিধা ও সন্দেহ নেই?' তখন সবাই বললেন : 'এসব সত্য এবং আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।'

অতঃপর তিনি বললেন : 'হে লোকসকল! আমি দু'টি মূল্যবান ও ভারী জিনিস তোমাদের মাঝে রেখে যাচ্ছি। আমরা দেখব, তোমরা আমার রেখে যাওয়া এ দু'টি স্মৃতিচিহ্নের সাথে কেমন আচরণ কর?' ঐ সময় একজন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন : 'এ দুটি ভারী জিনিস কী?' মহানবী বললেন : 'একটি মহান আল্লাহ্র কিতাব (পবিত্র কুরআন), যার এক প্রান্ত মহান আল্লাহ্র হাতে এবং অপর প্রান্ত তোমাদের হাতে আছে এবং অপরটি আমার বংশধর (আহ্লে বাইত)। মহান আল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন, এ দুই স্মৃতিচিহ্ন কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না।'

এরপর তিনি সমবেত লোকদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন : 'হে লোকসকল! পবিত্র কুরআন ও আমার বংশধর থেকে অগ্রগামী হয়ো না এবং কার্যত এতদুভয়ের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করো না; এর অন্যথা করলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।'

এ সময় মহানবী (সা.) আলী (আ.)-এর হাত উঁচু করে ধরেন এবং আলী (আ.)-কে উপস্থিত জনতার কাছে পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করেন : 'মুমিনদের চেয়ে তাদের নিজেদের ওপর কে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত?' তখন সবাই জবাব দিলেন : 'মহান আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।' মহানবী তখন বললেন : 'মহান আল্লাহ্ আমার মাওলা এবং আমি মুমিনদের মাওলা; আর আমি তাদের নিজেদের ওপর তাদের চেয়ে বেশি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এবং সবচেয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন। সুতরাং হে লোকসকল! আমি যার মাওলা, এই আলীও তার মাওলা।'

এরপর তিনি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন : 'হে আল্লাহ! যে তাকে (হযরত আলীকে) সমর্থন করবে তাকে তুমিও সমর্থন কর; যে তার সাথে শত্রুতা করবে, তার সাথে তুমিও শত্রুতা কর; যে তাকে ভালোবাসবে, তাকে তুমিও ভালোবাস; যে তাকে ঘৃণা করবে, তাকে তুমিও ঘৃণা কর; যে তাকে সাহায্য করবে, তাকে তুমিও সাহায্য কর এবং যে তাকে সাহায্য থেকে বিরত থাকবে, তাকে তুমিও সাহায্য থেকে বিরত থাক এবং সে যেদিকে ঘোরে, সত্যকেও তার সাথে সেদিকে ঘুরিয়ে দাও।'

মহানবীর ভাষণের পর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ হযরত আলীর সাথে মুসাফাহা করে তাঁকে অভিনন্দন জানান। সবার আগে হযরত আবু বকর ও হযরত উমর হযরত আলীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং শুভেচ্ছা জানান।

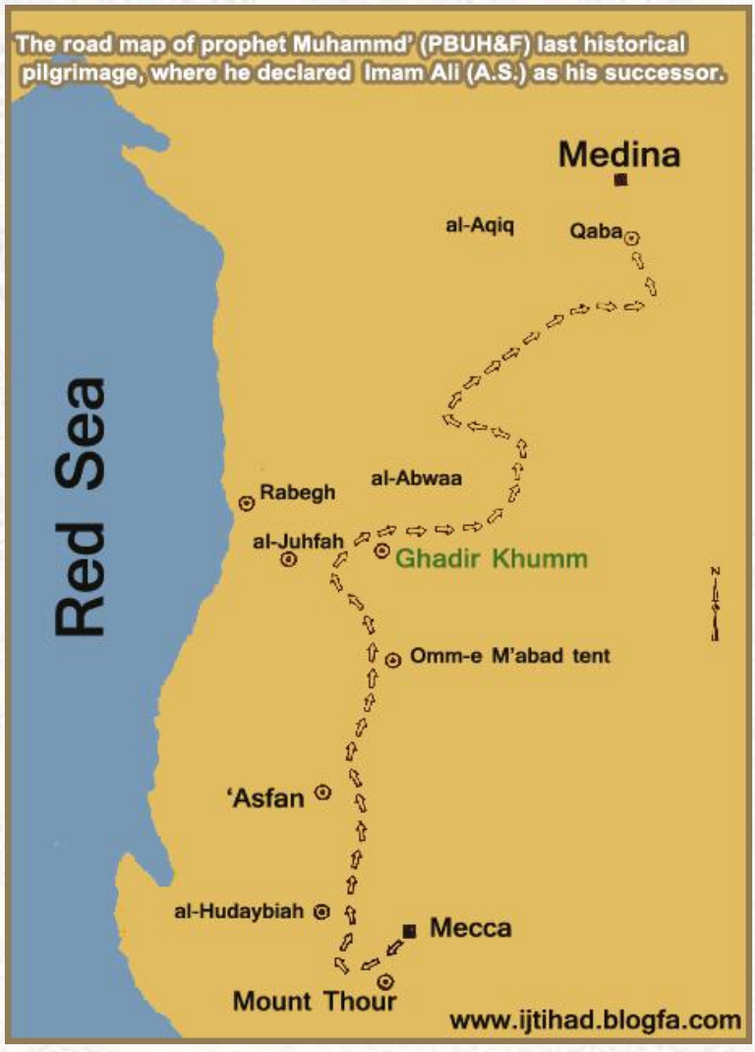

সাহাবী কবি হাস্‌সান ইবনে সাবিত মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তৎক্ষণাৎ একটি কবিতা রচনা করেন এবং তা তাঁর সামনে আবৃত্তি করেন। এই কবিতার দু'টি পঙ্‌ক্তি নিচে তুলে ধরা হলো :

فقال له: قم يا علىّ، فإنّنِى رضيتك من بعدى إماما و هاديا

فمن كنت مولاه فهذا وليّه فكونوا له أَتبـاع صدق مواليا

'অতঃপর তিনি তাঁকে বললেন : হে আলী! উঠে দাঁড়াও।
কারণ, আমি তোমাকে আমার পরে ইমাম (নেতা) ও পথপ্রদর্শক মনোনীত করেছি।
অতএব, আমি যার মাওলা (অভিভাবক ও কর্তৃপক্ষ), সেও তার ওয়ালী।
তাই তোমরা সবাই তার সত্যিকার সমর্থক ও অনুসারী হয়ে যাও।'

গাদীরে খুমের ঘটনার চিরস্থায়িত্ব

গাদীরে খুমের ঐতিহাসিক ঘটনা সর্বকাল ও সর্বযুগে এক জীবন্ত ইতিহাস রূপে বিদ্যমান। মুসলিম লেখক ও গ্রন্থ রচয়িতাগণ তাঁদের প্রণীত গ্রন্থসমূহে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন এবং একে ইমাম আলী (আ.)-এর অন্যতম ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব বলে গণ্য করেছেন। গাদীরে খুমের ঘটনা মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির, কালামশাস্ত্রবিদ, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও জীবনচরিত রচয়িতাগণের মতো বিভিন্ন শ্রেণির মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং তাঁরা এ ব্যাপারে অতিশয় গুরুত্ব প্রদান করেছেন– যা অন্য কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় না।

এ ঐতিহাসিক ঘটনার গুরুত্ব তুলে ধরার ক্ষেত্রে এতটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, মহানবী (সা.)-এর ১১০ জন সাহাবী এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হিজরি দ্বিতীয় শতকে তাবেয়িগণের যুগেও ৮৯ জন তাবেয়ী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী শতকসমূহেও হাদীসে গাদীরের বর্ণনাকারিগণের সংখ্যা অনেক। তাঁদের মধ্য থেকে ৩৬০ জন তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে এ হাদীসটি সংকলন করেছেন এবং অনেকেই এ প্রসঙ্গে বর্ণিত অনেক হাদীসের বিশুদ্ধতা ও সঠিক (সহীহ) হবার বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

হিজরি তৃতীয় শতকে ৯২ জন আলেম, চতুর্থ শতকে ৪৩ জন, পঞ্চম শতকে ২৪ জন, ষষ্ঠ শতকে ২০ জন, সপ্তম শতকে ২১ জন, অষ্টম শতকে ১৮ জন, নবম শতকে ১৬ জন, দশম শতকে ১৪ জন, একাদশ শতকে ১২ জন, দ্বাদশ শতকে ১৩ জন, ত্রয়োদশ শতকে ১২ জন এবং চতুর্দশ শতকে ২০ জন আলেম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আলেমগণের কেউ কেউ কেবল এ হাদীস বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হন নি; বরং এ হাদীসের সনদ এবং এর অন্তর্নিহিত অর্থ নিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন।

প্রখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক তাবারী 'আল ওয়ালায়াহ্ ফী তুরুকি হাদীসিল গাদীর' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এ হাদীস মহানবী (সা.) থেকে ৭২টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনে উকদাহ্ কুফী 'বেলায়াত' নামক সন্দর্ভে এ হাদীস ১০৫ জন রাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে উমর বাগদাদী এ হাদীস ২৫টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসশাস্ত্রবিদগণের মধ্য থেকে আহমাদ ইবনে হাম্বাল এ হাদীস ৪০টি সূত্রে, ইবনে হাজার আসকালানী ২৫টি সূত্রে, জাযারী শাফেঈ ২৫টি সূত্রে, আবূ সাঈদ সুজিস্তানী ১২০টি সূত্রে, আমীর মুহাম্মদ ইয়েমেনী ৪০টি সূত্রে, নাসাঈ ২৫০টি সূত্রে, আবুল আলা হামাদানী ১০০টি সূত্রে এবং আবুল ইরফান হিব্বান ৩০টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

যেসব ব্যক্তি এ মহান ঐতিহাসিক ঘটনার বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্রান্ত বই-পুস্তক রচনা করেছেন তাঁদের সংখ্যা ২৬। আল্লামা আয়াতুল্লাহ্ আমীনী এ ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে 'আল গাদীর' নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন।

আশুরা কোরবানির মরমি ব্যাখ্যা

সংকলন : ড. এম আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

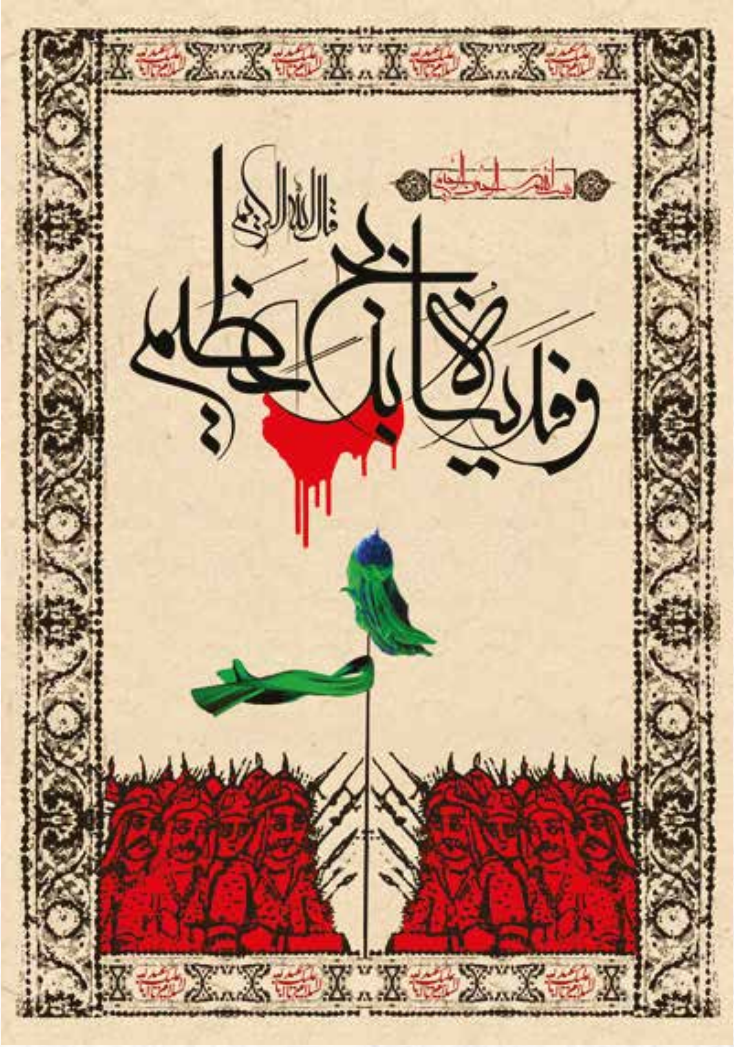

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রিয় দৌহিত্র, মা ফাতিমাতুয যাহরা ও শেরে খোদা হযরত আলী (আ.)-এর কলিজার টুকরা, বেহেশতের সর্দার হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) ৬১ হিজরির দশই মুহররম কারবালার প্রান্তরে নির্মমভাবে শাহাদাতবরণ করেন। অভিশপ্ত ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়ার হুকুমে নামধারী মুসলমানদের হাতে তিনদিনের দানাপানিবিহীন ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় ইমাম হোসাইন (আ.)-এর সপরিবারে কোরবানি হওয়ার বেদনায় যে কোনো মানুষের হৃদয় কেঁদে ওঠে। কিন্তু এ ক্রন্দন কি শুধুই একটি মানবিক অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ যা অন্য সব মানুষের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়? নাকি আশুরা কোরবানির আলাদা কোনো মহিমা রয়েছে, যা জাগতিক ও মানবিক স্তরকে অতিক্রম করে যায় এবং আধ্যাত্মিক ও ঐশী স্তরে গিয়ে পৌঁছে? আল-কোরআনে যাকে 'যিব্হ-ই আযীম' তথা মহাকোরবানি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নিশ্চয় যারা আশুরার শোকাবহ অনুভূতিকে অস্বীকার করতে চায় তারা নিজেদের চিন্তা ও বিশ্বাসকে জাগতিকতার ঊর্ধ্বে উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হয়নি। যে ইমাম হোসাইন (আ.) তাঁর বিখ্যাত দোয়া-ই আরাফা'র মধ্যে ঘোষণা করেছেন : 'হে আমার রব! যে তোমাকে পেয়েছে সে কী হারিয়েছে? আর যে তোমাকে হারিয়েছে সে কী পেয়েছে?' সেই ইমামের এই মহান কোরবানি যে জাগতিক ও মানবিকতাকে ছাড়িয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক। তাই এ প্রবন্ধে আশুরার দিনে সাইয়্যেদুশ শুহাদা ইমাম হোসাইন (আ.)-এর মহান কোরবানির একটি মরমি তথা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা উপস্থাপনের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

মরমিবাদী আরেফগণ ইমাম হোসাইন (আ.)-কে একজন ইনসানে কামেল তথা পূর্ণাত্মা মানবের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে মনে করে থাকেন। একারণে তাঁদের নিকট ইমাম হোসাইন (আ.)-এর মর্যাদা নিছক একজন ইমাম তথা সমাজের নেতার পর্যায় থেকে অতিক্রম করে অনেক ঊর্ধ্বে চলে যায়। কেননা, একজন ইমাম যদি রাজনৈতিক প্রেক্ষিত থেকে মুসলমানদের বিষয়াদি পরিচালনা করার দায়িত্ব পালন করে থাকেন, তবে একজন ইনসানে কামেল এর দায়বদ্ধতা গোটা বিশ্বজাহানের কাছে। অন্যভাষায় বলা যায়, ইনসানে কামেল হচ্ছেন জমিনে আল্লাহর খলীফা তথা প্রতিনিধি। তিনি যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যান, তার অর্থ হলো গোটা বিশ্ব জাহান ও জীবনের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়া। একারণে মরমিবাদী আরেফগণ আশুরার ঘটনাকে এমন একটি ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করেন যেখানে একজন ইনসানে কামেল উপস্থিত ছিলেন। আরেফগণের শুহুদী দৃষ্টিতে নিশ্চয় এ কোরবানির চেহারা ধরা পড়বে এক অনবদ্য আধ্যাত্মিক পরিমাত্রায়, ঐশী সুবাসে।

আশুরার প্রতি ইরফানি দৃষ্টিভঙ্গিতে ইরফানের মাকাম তথা স্তরসমূহও বিবেচনায় নেওয়া হয়। এই দৃশ্যপটে আশুরার প্রত্যেক শহীদ একদিকে যেমন এক একটি ইরফানি উপাদান, আবার একই সাথে এক একটি ইরফানি সিম্বল তথা প্রতীকও বটে। এভাবে আশুরায় যে ইরফানি সেইর ও সুলুক সংঘটিত হয়েছে তার কোনোটাই দৃষ্টি থেকে বাদ পড়ে না। স্বয়ং ইমাম হোসাইন (আ.) ছিলেন ইরফানের কুতুব তথা মূল অক্ষ। আর অবশিষ্ট মহান শহীদগণও অন্যান্য ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছেন। উল্লেখ্য, সব মরমি সাধকই যে এ ব্যাপারে একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন, সেটা বলা যায় না। কিংবা সে বিষয়ে আলোচনা করাও এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বরং বিখ্যাত মরমি কবি হাকিম সানায়ী গাযনাভী'র কাব্যের আলোকে শীর্ষ আরেফগণের

দৃষ্টিভঙ্গিই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

হাকিম আবদুল মাজদ মাজদুদ বিন আদাম সানায়ী গাযনাভী (১০৮০-১১৪১ খ্রি.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আহলে বাইতের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা পোষণ করতেন। তিনি আহলে বাইতের প্রতি এই ভালোবাসা আর বনি উমাইয়্যার প্রতি ঘৃণার মাধ্যমে নাজাতের আশা রাখতেন। আলী (আ.)-এর প্রতি ও তাঁর দুই পুত্র ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনের প্রতি ভক্তি এবং ভালোবাসার মাধ্যমে তিনি বেহেশতে প্রবেশ করার তাওফিক কামনা করতেন :

আমি দুইটা কারণকে আশায় রাখি
যদিও আমি গোনাহগার পাপী
এই দুই কারণে পেতে পারি নাজাত
যা থেকে বে-খবর সবে ইয়া রব!
একটি হলো আলে রাসূলের ভালোবাসা
ঐ সিংহপুরুষের, যিনি বাতুলের জোড়া
অপরটি হলো আলে বু-সুফিয়ানের ঘৃণা
যারা ছিল আলে মুহাম্মাদের শত্রু সর্বদা
আশা, এই দুই উসিলাই দেবে নাজাত আমায়
আর জাহান্নাম থেকে আমাকে দেবে রেহাই
রোজ হাশরের দিনে এটুকুই সম্বল আমার
আশা করা যায় এটাই হবে দ্বীনের বিচার।[১]

উপরিউক্ত বয়েতগুলোতে 'তাওয়াল্লা' এবং 'তাবাররা'– এই দুইটি মূলনীতির কথা বলা হয়েছে। তাওয়াল্লা হচ্ছে ইমাম হোসাইন (আ.)-এর প্রতি। আর তাবাররা হচ্ছ ইয়াযিদ ও সমস্ত বনি উমাইয়্যা হতে। উপরন্তু ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনের প্রতি ভালোবাসা নাজাতের কারণ এবং খোদায়ী বেহেশতে প্রবেশের উসিলা হবে বলে আশা প্রকাশ।

আট বেহেশতকে কখনো কি সন্ধান পাবে কোথাও
যদি না থাকে মহব্বত আলীর, শাব্বিরের ও শুবাইরের।[২]

সানায়ী গাযনাভী বিশ্বাস করতেন যে, হাসানাইন (আ.)-এর সম্পর্কে কথা বলতে গেলে আগে হোসাইনী হাল, চরিত্র ও স্বভাবের অধিকারী হতে হবে। একারণে তিনি মনে করতেন, যে ব্যক্তি আহলে বাইতের অনুসারী বলে দাবি করে, তাকে সবদিক থেকে পুণ্যময় চরিত্র দ্বারা চরিত্রবান হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে :

তুমি ঈমানের দাবি করবে আর নাফ্সের নির্দেশ মেনে চলবে?

বাইয়াত করবে আলীর সাথে আর হাসানকে বিষ পান করাবে?[৩]

সানায়ী ইয়াযিদ ও তার লোক-লস্করের প্রতি এতটাই ঘৃণা পোষণ করতেন যে, ইয়াযিদের হাতে বাইয়াতকারীদেরকে আরেক ইয়াযিদ বলে আখ্যায়িত করেন। নতুবা কোনো সুস্থ-বিবেকের মানুষ ইয়াযিদের সাথে বাইয়াত করতে রাজি হতে পারে না, আর মুমিন মানুষের তো প্রশ্নই আসে না। ইয়াযিদ ও শিমারের প্রতি তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে ইমাম হোসাইন (আ.)-কে তিনি 'শহীদদের সম্রাট' বলে মনে করেন।

গোটা দুনিয়ার সবখানে ভরা কত শহীদে
কিন্তু কারবালার হোসাইনের ন্যায় শহীদ তুমি পাবে কোথায়?[৪]

সানায়ী'র দৃষ্টিকোণ থেকে আশুরা বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার কারণ ছিল এটা যে, একদল দুনিয়ালিপ্সু লোকের ইমাম হোসাইন (আ.)-এর ন্যায় অপার্থিব ব্যক্তিত্বকে সহ্য করার সামর্থ্য ছিল না। বাদুড় যেমন দিনের আলোয় চলতে পারে না বলে সূর্যের আলোকে

এড়িয়ে রাতের আঁধারে বের হয়, জুলুমপূজারী জালেমরাও তদ্রূপ তাদের চলার পথে বাধা হিসাবে ইমাম হোসাইন (আ.)-এর সূর্যের ন্যায় আলোকোজ্জ্বল অস্তিত্বকে সরিয়ে ফেলতে তৎপর হয়ে ওঠে। এই অন্ধকারে বিচরণকারী দলটি শুধু যে ইমাম হোসাইন (আ.)-এর সাথে এরূপ আচরণ করেছে, তা নয়; বরং এর আগে তাঁর মহান পিতার সাথেও একই আচরণ করেছে। আমিরুল মুমিনীন আলী (আ.)-এর সাথে তাদের বিরোধিতার পেছনেও মূল দর্শন ছিল এটাই। আর আলী (আ.)ও যে তাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরতেন, সেটাও ছিল এই কারণে। কেননা, শেরে খোদার প্রত্যেকটি তলোয়ার আঘাত যা নিশাচরদের মস্তকের উপর নেমে আসত, উদ্দেশ্য ছিল যাতে খোদায়ী নূরের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ সে আলো থেকে উপকৃত হতে সক্ষম হয়।

তারা যেহেতু জাহেলি যুগে এবং হযরত আলী (আ.)-এর খেলাফতের আমলে তাঁর থেকে বিষাক্ত আঘাতে জর্জরিত হয়েছিল, একারণে ৬১ হিজরিতে এর বদলা গ্রহণে উদ্যত হয়, যাতে ঐসমস্ত পরাজয়ের আংশিক উসূল করতে পারে। আর হোসাইন (আ.) ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের প্রতি গালি ও অভিসম্পাত বর্ষণের মাধ্যমে মাওলা আলীকে খাটো করতে পারে। সুতরাং ইমাম হোসাইন (আ.)-এর কতলের রহস্য খুঁজতে হবে ইয়াযিদী জাহেল ও জুলুমপূজারীদের সেই সব পরাজয়ের মধ্যে যেগুলোতে তারা শেরে খোদার জুলফিকারের মাধ্যমে পরাজিত হয়েছিল। সানায়ী এরূপ ইরফানি দৃষ্টিকোণ থেকেই ইয়াযিদ ও তার লোক-লস্করকে লানতের ও অভিসম্পাতের পাত্র হিসাবে গণ্য করেন এবং তাদেরকে নিন্দা ও সমালোচনা করা মানুষের জন্য ইহকাল ও পরকালে সম্মান ও মুক্তির উসিলা বলে মনে করেন :

যে কেউ ঐ কুকুরগুলোর নিন্দাবাদ জানাবে
জেনে রাখ, সে বাদশাহি পাবে পরলোকে।[৫]

মরমি আরেফ সানায়ী প্রকাশ্যে ও নির্দ্বিধায় ইয়াযিদ ও শিমারের প্রতি লানত বর্ষণ করেন এবং তাদেরকে চিরকালীন অভিশপ্ত হিসাবে গণ্য করেন। তিনি তাঁর 'লোগাতনামা'র মধ্যে জল্লাদদের একজন একজন করে নাম উল্লেখ করেছেন এবং তাদের উপর লানত বর্ষণ করেছেন। তাদের কৃতকর্মকে অত্যন্ত লজ্জাজনক আখ্যায়িত করে তাদেরকে নিন্দাবাদ জানিয়েছেন এবং প্রত্যাখ্যাত বলে ঘোষণা দিয়েছেন :

কারবালা যখন করল মাকাম ও মঞ্জিল নির্মাণ
সহসাই ইবনে যিয়াদ সেথা হানল আক্রমণ
দেহ থেকে মস্তকগুলো কাটল খঞ্জরে
বড় ফায়দার লোভ ছিল তাদের এই কর্মে
পিপাসিত আলী আসগর, তাকেও করে না রহম
আর ঐ কুকুরেরা মেনে নেয় এই নিদারুন জুলুম।[৬]

সানায়ী গাযনাভী কোথাও কোথাও ইয়াযিদ ও তার লোক-লস্করকে সামুদ গোত্রের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, তারাও ঠিক সেই কাজগুলোই করেছে যা সামুদ গোত্র করেছিল :

আমর বিন আস ও ইয়াযিদ ও ইবনে যিয়াদ
ঠিক যেন সেই গোত্র সামুদ, সালেহ ও আদ।
সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে অস্বীকার আর অস্বীকার
জুলুম আর অন্যায় করাই তাদের যত অঙ্গীকার।
অবিচার করায় একবারও করল না বিবেচন
মুস্তাফা ও মূর্তজার কথা করল না স্মরণ।
বুল-হাকামকে গ্রহণ করল, না আহমদ
নিজের কৃতকর্মে করল দোযখকে খরিদ।[৭]

অবশ্য মানুষের মধ্যে এমনও অনেকে রয়েছে যাদের অন্তর নিরেট কালো হওয়ার কারণে এবং আল্লাহর মারেফত না থাকার কারণে ইরফানের স্বাদই আস্বাদন করতে পারেনি। এরা দুনিয়ার মূল্যে নিজেকে বিক্রি করে দেয় এবং ইয়াযিদদের কাতারে দাঁড়ায়। যে কেউ ইমাম হোসাইন (আ.)-এর রক্ত ঝরাবার কাজে রাজি থাকবে, অবশ্যই সে পুণ্যবানদের ও আরেফগণের পক্ষ থেকে লানত ও অভিসম্পাত পাওয়ার যোগ্য হবে। অতএব, যে ব্যক্তি ইয়াযিদ ও আমর বিন আসের ন্যায় পাপিষ্ঠ লোকদের অনুসরণ করবে এবং এ নিয়ে গর্ব করবে, নিশ্চিতভাবে সে কেবল দুনিয়াতেই যে শুধু পুণ্যবানদের দোয়া-খায়ের থেকে বঞ্চিত হবে, তা নয়; বরং দুনিয়া এবং আখেরাতে তাদের বদদোয়া ও লানতের ভাগীদার হবে :

তুমি যে বল ইয়াযিদ আমার আমীর
আর পাপিষ্ঠ আমরে আস আমার পীর
তবে জেন পাপিষ্ঠ ইয়াযিদ হয় যার আমীর
কিংবা আমর বিন আস হয় যার পীর
আযাব ও লানত পাওনা হবে তার
সে তো নরাধম এক পাপিষ্ঠ বে-দ্বীন।[৮]

শুধু যে ইয়াযিদ ও তার দোসররা দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর আযাব ও আউলিয়াগণের লানতের পাত্র হবে, তা নয়; বরং যারা অন্যায়ভাবে এসব দুরাচারীকে পুণ্যভরে স্মরণ করবে, তারাও

তাদের দলভুক্ত হবে :
ন্যায়বিচারীর লানত হোক তাদের উপর
যারা শ্রদ্ধায় স্মরণ করে এই জালেমদের।[৯]

তবে অবশ্য ওলি-আউলিয়াগণ এবং তরিকতের সাধকবৃন্দ ইমাম হোসাইন (আ.) ও আত্মোৎসর্গী সঙ্গী-সাথিদের প্রতি দরুদ ও সানা প্রেরণ পাঠ করাকে নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করে থাকেন। আর এ কারণেই তাঁরা নিজেদেরকে সেই কাফেলার সহযাত্রী হিসাবে ঘেষেণা করেন যে কাফেলায় বর্শার মাথায় কাটা শির মোবারক থেকে কোরআন তেলাওয়াত করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে ইমাম হোসাইন (আ.) ও তাঁর সঙ্গী-সাথিদের প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ আর ইয়াযিদ ও তার দোসরদের প্রতি লানত প্রেরণ করা হচ্ছে হক ও বাতিল এই দুই বিপরীত পক্ষের মধ্যে সংগ্রামের অব্যাহত ধারাবাহিকতা। যা হযরত আদম সৃষ্টির শুরু থেকে অদ্যাবধি চলমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। একারণে ইমাম হোসাইন (আ.) সম্পর্কে কিংবা ইয়াযিদ সম্পর্কে একজন মানুষ কোন্ অবস্থান গ্রহণ করবে তার উপর নির্ভর করবে সে হক পথে সাইর করছে নাকি বাতিল পথে। আর একারণেই ইরফানি দৃষ্টিকোণ থেকে ইয়াযিদ, শিমার ও তাদের দোসরদের প্রতি লানত বর্ষণ করা অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে ও ভিত্তি খুঁজে পায়। সানায়ী'র ভাষায় :
আশুরা কোরবানির স্মরণ
সে তো সাইরকারীদের কল্বের শক্তির কারণ

সানায়ী দ্বীনি আমলসমূহ পরিপালনে কষ্ট ও মুসিবত সহ্য করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি তরিকতের বিভিন্ন স্তরে কঠিন শোকতাপগুলোকে বরণ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম হোসাইন (আ.)-এর নিকট থেকে মদদ কামনা করেন। ইরফানের অঙ্গনে ইমাম হোসাইন ও তাঁর সঙ্গী-সাথিদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে তিনি এমন এক মডেল হিসাবে উপস্থাপন করেন যা আর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। আর এ কারণেই আশুরার কোরবানি সম্পর্কে অধ্যয়ন করাকে নিজের উপরে এবং হাকিকত অন্বেষী মরমি সাধকদের জন্য ফরয বলে মনে করেন।

সানায়ী ইমাম হোসাইন (আ.)-এর কোরবানিকে শুধু একটি আত্মত্যাগের মডেল হিসাবে উপস্থাপন করেই ক্ষান্ত হননি; বরং মরমিবাদের যে 'মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুকে আস্বাদন করার চর্চা রয়েছে'– সেদিক থেকে তিনি ইমাম (আ.) ও তাঁর সঙ্গী-সাথিদেরকে স্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুকে আস্বাদন করার উত্তম নজির হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মহান ওলি-আউলিয়াগণ ও খোদায়ী পুরুষগণ হচ্ছেন তাঁরাই যাঁরা ইহজগতে তাঁদের নাফসের মৃত্যুকে অবলোকন করেছেন। পরিশেষে সানায়ী দাবি করেন যে, ইমাম হোসাইন (আ.) এই পরীক্ষাটি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন।

সানায়ী গাযনাভী আশুরা বিপ্লবের প্রকৃত স্বরূপ আর ইমাম হোসাইন (আ.)-এর চির অম্লান ব্যক্তিত্বের সঠিক অনুধাবন তখনই সম্ভব বলে মনে করেন যখন মানুষ গায়রুল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্নতার অভিজ্ঞতা লাভ করবে। অন্যথায় হোসাইন (আ.)-এর কাহিনী পাঠ করে তার কোনো উপকারে আসবে না। কারণ, ইমাম হোসাইন (আ.) এমন এক অগ্নিপরীক্ষার অভিজ্ঞতায় নেমেছেন যা মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদনকারীরা ছাড়া তা আস্বাদন করতে সক্ষম হবে না এবং তা অনুধাবন ও স্পর্শ করতে পারবে না।

হাকিম সানায়ী বিশ্বাস করেন, হক সবসময় বিজয়ী। যদিও ক্ষণিকের জন্য কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে। তাই ইমাম হোসাইন (আ.) এমন এক আন্দোলনের সূচনা করেন যার মূল শিকড় প্রোথিত রয়েছে আল্লাহর হাক্কানি সত্তার মধ্যে। এই কারণে তা কখনই বিস্মৃতির কবলে পড়বে না। পরাজয়ের ধুলোর আস্তরণও এর গায়ে বসবে না। হাকিম সানায়ী মনে করেন, যদিও পাপিষ্ঠ জালেমরা জাহেলিয়াতের বশবর্তী হয়ে খোদার দ্বীনের সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করেছে এবং রেসালাতের খান্দানের পবিত্র দরজা, যা ছিল জগতের শুদ্ধ পুরুষদের পছন্দনীয়, সেটাকে তারা পদদলিত করেছে, আর আলে ইয়াসীনের কর্তিত মস্তকগুলোকে বর্শার উপরে তুলেছে এবং তাদের শিরকাটা দেহগুলোর উপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়েছে, কিন্তু আসলে তারা তাদেরকে এসব কৃতকর্ম দ্বারা অনন্তকালীন লানত ও অভিসম্পাতে আক্রান্ত করেছে। আমি সানায়ী বনি উমাইয়্যা খান্দানের এসব অপকর্মের প্রতি অসন্তুষ্টি ঘোষণা করছি। কিন্তু কারবালার স্নিগ্ধ সমীরণ বেহেশতের বারতা বয়ে আনে যা অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য বটে। তাই আমি সেই নারীর গোলাম যিনি কারবালার স্নিগ্ধ সমীরণের সুবাস গ্রহণের জন্য প্রতিদিন শহরের বাইরে চলে আসতেন এবং পিশাচ দুশমনের কোনো পরোয়া করতেন না।

ইমাম হোসাইন (আ.) ও তাঁর সঙ্গী-সাথিদের অমরত্ব ও চিরন্তনতার পেছনে যে রহস্য নিহিত, সেটা হলো এই যে, তাঁরা হক (আল্লাহ) ও তাঁর সিফাতসমূহের তাজাল্লীকারী ছিলেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে খোদায়ী জামালের দর্পণসমূহ কখনই ভেঙ্গে যাবে না। বরং প্রত্যেক যুগ ও জামানায় আরও স্থায়ী ও টেকসই হবে। হাকিম সানায়ীর দৃষ্টিতে কারবালা হচ্ছে আল্লাহর বেহেশতেরই একটি টুকরা, যা জমিনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর কারবালার শহীদগণ হচ্ছেন সেই পবিত্র ফুলসমূহ, যা কারবালার মাটিতে ফুটেছে এবং গোটা জাহানকে সুরভিময় করে তুলেছে।

তথ্যসূত্র

১. হাদিকাতুল হাকিকা, ৬৪৩।
২. দিওয়ানে সানায়ী, ৪৭০।
৩. দিওয়ানে সানায়ী, ৫৩০।
৪. দিওয়ানে সানায়ী, ৫৭১।
৫. হাদিকাতুল হাকিকা, ২৭১।
৬. হাদিকাতুল হাকিকা, ২৬৯।
৭. প্রাগুক্ত।
৮. হাদিকাতুল হাকিকা, ২৭২।
৯. প্রাগুক্ত।